যথারীতি থানায় ডায়েরী ইত্যাদি হইল। কে তাহার বালা খুলিয়া লইয়াছে এ সম্বন্ধে খুকী বিশেষ কেনো খবর দিতে পারিল না। খুকীর মামাকে সকলে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল। খবরদারী করিবার যখন সময় নাই, তখন পরের মেয়ে আনা কেন ইত্যাদি। সবাই বলিল—যাও ওকে কলই বাড়ী রেখে এস, ছিঃ, ওই রকম ক'রে কি কখনো ...মেসের সকলে চাঁদা তুলিয়া খুকীকে দু'গাছা পালিস-করা বিলিতী সোনার বালা কিনিয়া দিল।

গাড়ীতে যাইবার সময় তাহার মামা বলিল—খুকু, বাড়ীতে গিয়ে যেন এসব কথা কিছু বলো না?...কেমন তো?...কক্ষনো বলো না যেন?...হ্যাঁ, লক্ষ্মী মেয়ে—তাহলে আর কলকাতায় নিয়ে আসব না...

খুকী ঘাড় নাড়িয়া রাজি হইল। বলিল—আমায় তখন একটা পুতুল কিনে দিও মামা...আর একটা মেম পুতুল...

প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৭

উমারাণী

বসন্ত প'ড়ে গিয়েছে না? দখিন্ হাওয়া এসে শীতকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশ এমন নীল যে, মনে হচ্ছে উড়ন্ত চিলগুলোর ডানায় নীল রং লেগে যাবে। এই সময় তার কথা আমার বড় মনে পড়ে। তার কথাই বলব।

মেডিকেল কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম দিনকতক গবর্ণমেণ্টের চাকরি নেবার বৃথা চেষ্টা করবার পর যে মাসে আমি একটা চা-বাগানের ডাক্তারী নিয়ে গৌহাটিতে চ'লে গেলুম, সেই মাসেই আমার ছোট বোন শৈল শ্বশুরবড়ীতে কলেরা হয়ে মারা গেল। এই শৈলকে আমি বড় ভালবাসতুম, আমার অন্যান্য বোনেদের সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক মারামারি করেছি, কিন্তু শৈলর গায়ে আমি কোনদিন হাত তুলিনি। শৈলর বিয়ে হয়েছিল যশোর জেলার একটা পাড়াগাঁয়ে। শৈল কখনো সে গ্রামে যায়নি, তার স্বামী তাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা ক'রে থাকত। তার স্বামী প্রথমে পাটের দালালী করত, তারপর একটা অফিসে ইদানিং কি চাকরি করত। যেখানে শৈলর স্বামী বাসা করেছিল তার পাশেই আমার মামার বাড়ী,—একটা গলির এপার ওপার। এই বাসায় ওরা শৈলর বিয়ের অনেক আগে থেকেই ছিল এবং শৈলর বিয়েও মামার বাড়ী থেকেই হয়।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বাগানের ম্যানেজারের বাংলো থেকে একটা ঘা ড্রেস ক'রে ফিরছি, পিওন খানকতক চিঠি আমার হাতে দিয়ে গেল। আমার বাসায় ফিরে এসে তারি একখানাতে শৈলর মৃত্যুসংবাদ পেলুম। বাংলোর চারি পাশের ঝাউ, কৃষ্ণচূড়া ও সরল গাছগুলো সন্ধ্যার বাতাসে সন্ সন্ করছিল। আমার চোখের সামনে সমস্ত চা-বাগানটা, দূরের ঢালু পাহাড়ের গাটা, মারঘেরিটা, ২নং বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর সাদা রংটা, দেখতে দেখতে সবগুলো মিলে একটা জমাট অন্ধকার পাকিয়ে তুলল।

আলো জ্বালিয়ে চুপ ক'রে ঘরের মধ্যে ব'সে রইলুম। বাইরের হাওয়া খোলা দুয়ার জানলা দিয়ে ঢুকতে লাগল। অনেক দিনের শৈল যে! কলকাতা থেকে ছুটি পেয়ে যখন বাড়ী যেতুম, শৈল বেচারী আমায় তৃপ্তি দেবার পন্থা খুঁজে ব্যাকুল হয়ে পড়ত। কোথায় কুল, কোথায় কাঁচা তেঁতুল, কার গাছে কথ্‌বেল পেকেছে, আমি বাড়ী আসবার আগেই শৈল এসব ঠিক ক'রে রাখত; নানারকম মশলা তৈরী ক'রে কাগজে মুড়ে রেখে দিত. আমি বাড়ী গেলেই তার আনন্দ জড়ানো ব্যস্ততা ও ছুটোছুটির আর অন্ত থাকত না।

গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি বাড়ী গেলে আমায় বেলের শরবৎ খাওয়াবার জন্যে পরের গাছে বেল চুরি করতে গিয়ে ঘরের পরের কত অপমান সে সহ্য করেছে ; আমারই জুতো বুনে দেবে ব'লে তার উল বুনতে শেখা। সেই শৈল তো আজকের নয়, যতদূর দৃষ্টি যায় পিছনে ফিরে চেয়ে দেখলুম কত ঘটনার সঙ্গে, কত তুচ্ছ সুখ-দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে কত খেলাধুলোয় শৈল জড়ানো রয়েছে। সে আজ ঐ আকাশের মাঝখানকার জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষি মন্ডলের মত দূরের হয়ে গেল, ঝাউগাছের ডালপালার মধ্যেকার ঐ বাতাসের শব্দের মতই ধরাছোঁয়ার বাইরে চ'লে গেল!

তার পরদিন ছুটি নিয়ে দেশে চ'লে গেলুম। বাড়ীর সকলকে সান্ত্বনা দিলুম। আহা, দেখলুম আমার ভগ্নীপতি বেচারা বড় আঘাত পেয়েছে। শৈলর বিয়ে হয়েছিল এই মোটে তিন বৎসর, এই সময়ের মধ্যেই সে বেচারা শৈলকে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলুম। শৈল প্রথম বুনতে শিখেই আমার ভগ্নীপতির জন্যে একটা গলাবন্ধ বুনছিল, সেটা আধ-তৈরী অবস্থায় প'ড়ে আছে, ভগ্নীপতি সেইটে আমার কাছে দেখাতে নিয়ে এল। সেইটে দেখে আমার মনের মধ্যে কেমন একটু হিংসে হ'ল, আমার জুতো বুনে দেবার জন্যে উল্ বুনতে শিখে শেষে কিনা নিজের স্বামীর গলাবন্ধ আগে বুনতে যাওয়া! তবু তো সে আজ নেই!

পরে আবার গৌহাটি ফিরে গিয়ে যথারীতি চাকরি করতে লাগলুম। দেশ থেকে এসে আমার ভগ্নীপতির সঙ্গে প্রথম প্রথম খুব পত্র লেখালেখি ছিল, তারপর তা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। তার আর বিশেষ কোন সংবাদ রাখতুম না, তবে মাঝে মাঝে মামার বাড়ীর পত্রে জানতে পারতুম, সে অনেকেরে অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করতে রাজী নয়। বিবাহ সে আর নাকি করবে না।

এই রকম ক'রে বিদেশে অনেক দিন কেটে গেল, দেশে যাবার বিশেষ কোন টান না থাকাতে দেশে বড় যেতুম না। আমার মা বাবা অনেকদিন মারা গিয়েছিলেন, বোন-গুলির সব বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমি নিজেও তখন অবিবাহিত, কাজেই আমার পক্ষে দেশ-বিদেশ দু-ই সমান ছিল। চা-বাগানের কাজের কোন বৈচিত্র্য ছিল না, সকালবেলা ডাক্তারখানায় ব'সে নীরস একঘেয়ে ভাবে কুলীদের হাত দেখা, কলের পুতুলের মত ঔষধ লিখে দেওয়া। রোগ তাদের যেন বড় একঘেয়ে রকমের, সাদা জ্বর, হিল্ ডায়েরিয়া, বড় জোর কালাজ্বর, কালে-ভদ্রে এক-আধটা টাইফয়েড বা শক্ত রকমের নিউমোনিয়া। যখন হাতে কাজকর্ম বিশেষ থাকত না তখন পড়তুম, না হয় আমার একটা খেয়াল আছে—অপটিক্সের বা আলোকতত্ত্বের চর্চা করা—তাই করতুম। বাংলোর একটা ঘর এই উদ্দেশ্যে আঁধার ঘর বা ডার্করুমে পরিণত করে নিয়েছিলুম। কলকাতা থেকে প্রতি মাসে অনেক ভাল ভাল লেন্স ও অপটিক্সের বই সব আনাতুম।

বছর তিনেক এই ভাবে কেটে গেল। এই সময় মামার বাড়ির পত্রে জানলুম, আমার ভগ্নীপতি আবার বিবাহ করেছে। সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির হাত সে নাকি আর এড়াতে পারলে না। এতে মনে মনে আমি তাকে কোন দোষ দিতে পারলুম না, শৈলর প্রতি তার ভালবাসা অকৃত্রিমই, তারই বলে সে এতদিন যুঝলো তো?

সেবার বৈশাখ মাসের প্রথমে দেশে গিয়ে মামার বাড়ী উঠলুম। আমার এমন কতক-গুলো কথা অপটিক্স সম্বন্ধে মনে এসেছিল, যা একজন বিশেষজ্ঞের নিকট বলা নিতান্ত আবশ্যক ছিল। আমার এক বন্ধু সেবার বিলাত থেকে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বস্তু-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিল, তার সঙ্গে সে সব বিষয়ের কথাবার্তা কইবার জন্যেই

আমার এক রকম কলকাতায় আসা। তার ওখানে যাতায়াত আরম্ভ করলুম, সেও খুব উৎসাহ দিল, অপটিক্স নিয়ে একেবারে মেতে উঠলুম।

এই অবস্থায় একদিন সকালবেলা বারান্দায় বসে পড়ছি, হঠাৎ আমার চোখ প'ড়ে গেল সামনের বাড়ীর জানলাটায়। সেইটেই আমার ভগ্নীপতির বাসা। দেখলুম কে একটি অপরিচিতা মেয়ে ঘরের মধ্যে কি কাজ করছে। আমার দিক থেকে শুধু তার সুপুষ্ট হাত দুটি দেখা যাচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল তার পিঠের দিকটা খুব চওড়া।

একটু পরেই সেই ঘরের ভিতর ঢুকল আমার ভগ্নীপতির বোন টুনি। টুনির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বোধ হয় সম্প্রতি শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে। আমি গৌহাটি থেকে এসে পর্যন্ত ওদের বাড়ী যাইনি। টুনিকে দেখে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—টুনি, ঐ মেয়েটি কি নতুন বৌ?

—হ্যাঁ, দাদা।

—দেখি একবার।

টুনি মেয়েটিকে ডেকে কি বললে, তাকে জানলার কাছে নিয়ে এসে তার ঘোমটা খুলে দিলে। ভাল দেখা গেল না। গলির এপারে আমাদের মামাদের বাড়ীটা উঠে গলির ওপারের বাড়ীর ঘরগুলোকে প্রায় অপটিকচর্চার ডার্করুম ক'রে তুলেছিল, দিন-মানেও তার মধ্যে আলো যায় না। ভাল দেখতে না পেয়ে বললুম—হ্যাঁ রে, কিছুই তো দেখতে পেলুম না।

টুনি হেসে উঠল, বললে—আপনি ওখান থেকে যে দেখতে পাবেন না, তা আমি জানি। তার ওপর তো আবার চশমা নিয়েছেন—তার পর কি ভেবে টুনি গম্ভীর হল, বললে—আপনি এসে পর্যন্ত তো এ বাড়ী একবারও আসেননি, দাদা। আজ দুপুরবেলা একবার আসবেন?

দুপুরবেলা ওদের বাড়ী গেলুম। বাড়ী ঢুকতেই মনে হল, চার পাঁচ বছর আগে ভাইফোঁটা নিতে শৈলর নিমন্ত্রণে এ বাড়ী এসেছিলুম, তারপর আর এ বাড়ী আসিনি। দালান পার হয়ে ঘরে যেতে বাড়ীর মেয়েরা সব আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হয়ে গেলে টুনি বললে—দাদা, বৌ দেখবেন আসুন। ঘরের মধ্যে গেলুম। টুনি নতুন বৌয়ের ঘোমটা খুলে দিয়ে বললে—ওঁর সামনে ঘোমটা দিতে হবে না বৌদি। উনি তোমার দাদা।

মেয়েটি আধ-ঘোমটা অবস্থায় গলায় আঁচল দিয়ে আমায় পায়ের কাছে প্রণাম করছে। দিব্যি মেয়েটি তো! রং খুব গৌরবর্ণ, ভারি সুন্দর মুখখানির গড়ন। একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া ঠাস-বুনানি কালো চুল মাথা ভর্তি। বেশ মোটাসোটা গড়ন। বয়স বোধ হয় চৌদ্দ-পনেরো হবে। টুনির মা বললেন—মেয়েটির বাপ পশ্চিমে চাকরি করেন, সেখানেই বরাবর থাকেন। ওই এক মেয়ে, অন্য ছেলেপিলে কিছু নেই। তাঁদের সঙ্গে কি জানাশুনো ছিল, তাই এখানেই সম্বন্ধ ঠিক ক'রে বিয়ে দিয়েছেন।

মেয়েটি প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালে আমি তার হাত ধ'রে তাকে কাছে নিয়ে এলুম। বাঁ হাতে তার ঘোমটা আর একটু খুলে দিয়ে বললুম—আমার কাছে লজ্জা করো না খুকী, আমি যে তোমার দাদা। তোমার নামটি কি?

তার চোখের অসংকোচ দৃষ্টি দেখে বুঝলুম, মেয়েটি সেই মুহূর্তেই আমার বোন হয়ে পড়েছে।

সে খুব মৃদুস্বরে উত্তর দিল—উমারাণী।

আমি বললুম—আচ্ছা, আমরা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? এসো উমারাণী এই চৌকিটায় ব'সে তোমার সঙ্গে একটু কথা কই।

আমি চৌকিতে তাকে কাছে নিয়ে বসলুম, খানিকক্ষণ তার সংগে একথা সেকথা নানা কথা কইলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম—বাড়ী ছেড়ে এসে বড় মন কেমন করছে, না?

উমারাণী একটু হেসে চুপ করে রইল।

আমি বললুম—তোমার বাবা থাকেন কোথায়?

—মাউ।

আমি মাউয়ের নাম কখনো শুনিনি। জিজ্ঞাসা করলুম—মাউ, সে কোনখানে বলো দেখি?

—সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ায়।

—তোমার বাবা সেখানে কি কাজ করেন?

—কমিসারিয়েটে চাকরি করেন।

—তোমার আর কোন ভাই-বোন নেই, না?

—না। আমার পর আমার আর এক বোন হয়, সে আঁতুড়েই মারা যায়। তারপর আর হয়নি।

বাড়ী ছেড়ে অনেক দূরে এসেছে, ভাবলুম হয়ত বাপ-মায়ের কথা বলতে মেয়েটির মনে কষ্ট হচ্ছে। কথার গতি ফিরিয়ে দেবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি লেখাপড়া জান, উমারাণী?

—আমি সেখানে মেয়েদের স্কুলে পড়তাম, বাংলা পড়া হ'ত না ব'লে বাবা ছাড়িয়ে নেন। তারপর বাড়িতে বাবার কাছে পড়তাম।

—বাংলা বই বেশ পড়তে পার?

—পারি।

আমি উমারাণীর কথাবার্তা কইবার ভাবে ভারি আনন্দিত হলুম। এমন সুন্দর শান্তভাবে সে কথাগুলি বলছিল মাটির দিকে চোখদুটি রেখে যে আমার বড় ভাল লাগল। আমি তার মাথায় একটা আদরের ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম—বেশ, বেশ। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা, অন্য আর এক সময়ে আসব, এখন আসি।

দাঁড়িয়ে উঠেছি, উমারাণী আবার সেই গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলে। আমি তাকে বললুম—খুব শান্ত হয়ে থেকো কিন্তু উমারাণী। কোনো দুষ্টুমি যেন কোরো না, তাহলে দাদার কাছে,—বুঝলে তো?

উমারাণী হেসে ঘাড় নীচু করে রইল।

এর পাঁচ ছয় মাস পরে পুজোর সময় আবার মামার বাড়ী এলুম। অষ্টমী পুজোর দিন—দিনব্যাপী পরিশ্রমের পর একটা বড় ক্লান্তি বোধ হওয়াতে সন্ধ্যার আগে একটা ঘরের খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আমার মামার বাড়ী পুজো হ'ত। সমস্ত দিন নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করা, পরিবেশন করা প্রভৃতি নানা কাজে বড় খাটতে হয়েছিল। অনেক রাত্রে উঠে খেতে গেলুম। আমার ছোট ভাই খাবার সময় বললে—অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন তো দাদা? দিদি এসেছিলেন আরতির সময়, আপনাকে দেখবার জন্যে আপনার ঘরে গেলেন। আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আপনার পায়ে হাত দিলেন আপনাকে ওঠাবার জন্যে। আপনি উঠলেন না। তারপর তাঁরা সব চ'লে গেলেন। তিনি নাকি পরশু বাপের বাড়ী চ'লে যাবেন। আপনি অবিশ্যি একবার ওবাড়ী যাবেন কাল। আপনার সংগে দেখা না হওয়ায় দিদি বড় দুঃখ করে গিয়েছেন

আমি ঘুমের ঘোরে কথাটা তলিয়ে না বুঝে বললুম—দিদি মানে?

—ও বাড়ীর।

—উমারাণী ?

—হ্যাঁ। দিদি, টুনিদি, এ'রা সব আরতির সময় এসেছিলেন কিনা।

উমারাণীর কথা আমার খুব মনে ছিল। তার সেই ভক্তিনম্র মধুরব্যবহারটুকু আমার বড় ভাল লেগেছিল। তাই তাকে ভুলিনি, এবার চা-বাগানে গিয়ে মেয়েটির কথা অনেকবার ভেবেছি। তার পরদিন সকালে উঠে কাজকর্মের পাশ কাটিয়ে এক ফাঁকে ওদের বাড়ী গেলুম। বাইরে কাউকেও না দেখতে পেয়ে একেবারে ওদের রান্নাঘরের মধ্যে চ'লে গেলুম। টুনির মা বললেন—এস বাবা। তা এতদিন এসেছ, এবাড়ী কি একবারও আসতে নেই ?

আমি সময়োচিত কি একটা কৈফিয়ৎ দিলুম। উমারাণী মাছ কুটছিল ; আমি যেতেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চ'লে গেল। একটু পরেই হাত ধুয়ে এসে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলে। টুনির মা বললেন—বৌমা, সতীশকে দালানে নিয়ে গিয়ে বসাও গে। এখানে এই ধোঁয়ার মধ্যে···

দালানে যেতেই, টুনি কোথায় ছিল, এসে ব'লে উঠল—এ কি। দাদা যে ? কি ভাগ্যি। বৌদি দাদা দাদা ব'লে মরে—ফি-দিন আমায় জিজ্ঞেস করে—দাদা পুজোর ছুটিতে বাড়ী আসবেন তো? দাদার দায় প'ড়ে গিয়েছে খোঁজ করতে! চার-পাঁচদিন এসেছেন-এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ালে চণ্ডী কি অশুদ্ধ হয়ে যায় শুনি ?

আমাকে একটু অপ্রতিভই হত হ'ল। উমারাণীর কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম—হ্যাঁ রে রাণী, দাদার কথা তা হ'লে ভুলিসনি?

টুনির কথায় মেয়েটির খুব লজ্জা হয়েছিল, সে মুখ নীচু ক'রে আমার কাপড়ের কোণ হাতে নিয়ে চুপ ক'রে নাড়তে লাগল—আমি দালানে একটা খাটের ওপর ব'সে-ছিলুম, উমারাণী নীচে আমার পায়ের কাছটিতে ব'সে ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—শচীশ বলছিল, দিদি চ'লে যাবে সোমবারের দিন। সে কথা কি ঠিক ?

উমারাণী নতমুখেই উত্তর দিল—বাবা চিঠি দিয়েছিলেন ; একাদশীর দিন নিয়ে যাবেন। কিন্তু আজও তো এলেন না।

ওর গলার সুরটা যেন একটু কেঁপে গেল।

ওর বিরহী বালিকা-হৃদয়টি মা-বাপের জন্যে তৃষিত হয়ে উঠেছে বুঝে সান্ত্বনার সুরে বললুম—আসবেন ; আজ তো মোটে নবমী। আচ্ছা, কলকাতা কেমন লাগল রাণী ?

উমারাণী উত্তর দিল—বেশ ভাল।

আমি তার নত মুখখানির দিকে চেয়ে বললুম—তা নয় রে রাণী! ভাল কখনই লাগেনি, দাদার খাতিরে ভাল বললে চলবে না। কোথায় পশ্চিমের অমন জলহাওয়া, আর এই ধুলো ধোঁয়া—ভাল লাগতেই পারে না।

উমারাণী একটুখানি হেসে চুপ ক'রে রইল।

জিজ্ঞাসা করলুম—পশ্চিমে পুজো হয় রে রাণী?

সে বললে—ঠিক এদেশের মত হয় না। হিন্দুস্থানীরা কি একটা করে, সেও অনেকটা এই রকমের। আর সেখানে এ সময় রামলীলার খুব ধুম হয়।

আমি উঠে আসবার সময় উমারাণী আবার একবার আমার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করল। আমি বললুম—রাণী, আমি যতবার আসবো যাবো, ততবারই কি আমায় একটা ক'রে প্রণাম করতে হবে ?

উমারাণী বোধ হয় এই প্রথম বার আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললে—কাল

বিকেলে আসবেন, দাদা?

এর আগে উমারাণী কখনো আমায় দাদা ব'লে ডাকেনি। আমি ওর মুখে দাদা ডাক শুনে বড় আনন্দ পেলুম। বললুম—কাল তো বিজয়া দিশমী, আসব বৈকি।

তার পরদিন বিজয়া দশমী। সন্ধ্যার পর ওদের বাড়ী গেলুম। সকলকে প্রণাম করলুম। টুনি এসে বললে—আপনি দালানের পাশের ঘরে যান। ওখানে বৌদি আছেন।

আমি সে ঘরের দোর পর্যন্ত গিয়ে ঘরের মধ্যে একটা বড় সুন্দর দৃশ্য দেখলুম। তাতে ঘরের মধ্যে যাওয়া বন্ধ ক'রে আমায় দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

দেখি, ঘরের মধ্যে খাটের ওপরে বসে আমার ছোট ভাই শচীশ, তার বয়েস বার-তের। তার পাশে উমারাণী দাঁড়িয়ে খাটের পাশে একটা টেবিলের ওপরকার একখানা রেকাবি থেকে খাবার নিয়ে শচীশের মুখে তুলে দিয়ে তাকে খাওয়াচ্ছে। ওদের দু'জনকারই পেছন আমার দিকে।

এমন কোমল স্নেহের সঙ্গে উমারাণী শচীশের কাঁধের ওপর তার বাঁ হাতটি দিয়ে স্নেহময়ী বড়দিদির মত আপন হাতে তার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে যে, আমার মনে হ'ল আজ শৈল বেঁচে থাকলে সে এর বেশী করতে পারত না। উমারাণীর প্রতি এতদিন অননুভূত একটা স্নেহরসে আমার মন সিক্ত হয়ে উঠল। আমি খানিকক্ষণ দোরের কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের ভিতর ঢুকে প'ড়ে উমারাণীকে বললুম—লুকিয়ে লুকিয়ে ছোট ভাইকে খাওয়ালে শুধু হবে না, দাদাকে কি খেতে দিবি রে রাণী?

বেচারী উমারাণীর মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। সে এমন থতমত খেয়ে গেল হঠাৎ যে, খামকা যে এত প্রণাম করে, আজ বিজয়ার প্রণাম করতে সে ভুলে গেল। একটা কি কথা অস্পষ্টভাবে বার দুই ব'লে সে মাথা নীচু ক'রে রইল। আমি তার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, আজ যে তাকে ধ'রে ফেলেছি, তার ভাই-বোন-বিহীন নির্জন প্রাণটি কিসের জন্যে তৃষিত হয়ে আছে, তা যে আজ বার ক'রে ফেলেছি। আজ অনুভব করছিলুম, জগতের মধ্যে ভাইবোনের একটু স্নেহ পাবার জন্যে ব্যাকুল এমন অনেক হৃদয়কে আজ আমি আমার বড় ভাইয়ের উদার স্নেহ-ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছি। একটু বুকজুড়ানো তৃপ্তিতে আমার মন ভরে উঠল।

সেই সময় টুনি সে-ঘরে ঢুকে আমার সামনের টেবিলে থালা-ভরা মিষ্টান্ন রেখে বললে—দাদা, একটু মিষ্টিমুখ করুন।

আমি টুনিকে বললুম—আয় টুনি, সকলে মিলে…

উমারাণীকে খাটের ওপর বসালুম। খাবার সকলকেই দিলুম। উমারাণী লজ্জায় একেবারে আড়ষ্ট। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জ'মে গেল তার লজ্জার চোটে। বেচারী লজ্জায় আর ঘামে হাঁপিয়ে মারা যায় দেখে তার ঘোমটা বেশ ক'রে খুলে দিলুম। বললুম—আমি দাদা, আমার কাছে লজ্জা কি রে রাণী? আমার লক্ষ্মী ছোট বোনটি…

জলযোগ-পর্ব সমাধা ক'রে বাইরের দালানে এসে টুনির মায়ের সঙ্গে গল্প করতে আরম্ভ করলুম। একটু পরে তিনি উঠে রান্নাঘরে চ'লে গেলেন। আরও খানিক পরে, আমি উঠতে যাচ্ছি, উমারাণী কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলুম—রাণী, আজ ঠাকুর বিসর্জন দেখলি নে?

—ওপরের ঘরের জানলা থেকে দেখছিলুম, বেশ ভাল।

—অনেক রকমের প্রতিমা, না?

—হ্যাঁ, কত সব বড় বড়।—তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে বললে—দাদা, কাল আসবেন না?

আমি বললুম—সে কি বলতে পারি? সময় পাই তো আসব। আবার শীগ্‌গির চ'লে যাব কিনা, অনেক কাজ আছে।

—আপনি কি খুব শীগ্‌গির যাবেন দাদা?

—হ্যাঁ, বেশিদিন তো ছুটি নেই, পূর্ণিমার পরেই যেতেই হবে।

উমারাণী নতমুখে চুপ ক'রে রইল।

বললুম—তা তোকেও তো আর বেশীদিন থাকতে হবে না রে!

উমারাণী বলে—বাবা বোধ হয় কাল আসবেন।

ওকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললুম—তবে আর কি? এই দুটো দিন কোন রকমে কাটালেই তো...

সে একটু চুপ ক'রে থেকে তারপর যেন ভয়ে ভয়ে বললে—যাবার আগে একবারটি এ বাড়ী আসতে পারবেন না, দাদা?

বললুম—খুব খুব। আসব বৈকি। নিশ্চয়।

এর ছয় সাত দিন পর গৌহাটি রওনা হলুম। এই কদিন নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে ঘুরতে হয়েছিল। শচীশের মুখে শুনেছিলুম, উমারাণীর পশ্চিমে যাওয়া হয়নি। কি কারণে তার বাবা তাকে নিতে আসতে পারেননি। শচীশ মাঝে মাঝে বলত—দাদা, যাবার আগে একবার দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন। তিনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন।

ইচ্ছা থাকলেও গৌহাটি যাবার আগে উমারাণীর সঙ্গে দেখা করা আর আমার ঘটে ওঠেনি।

গৌহাটি গিয়ে এবার অনেক দিন রইলুম। উমারাণীর কথা প্রথম প্রথম আমার খুব মনে হ'ত, তারপর দিনকতক পরে তেমন বিশেষ ক'রে আর মনে হ'ত না, ক্রমে প্রায় ভুলেই গেলুম। কিছুদিন পরে গৌহাটির চাকরি ছেড়ে দিলুম। শিলচর, দার্জিলিং নানা চা-বাগান বেড়ালুম। দু'একটা হাসপাতালেও কাজ করলুম। সব সময় নির্জনে কাটাতুম। একা বাংলোয় থেকে থেকে কেমন হয়েছিল, অনেক লোকের ভিড়, অনেক লোকের একসঙ্গে কথাবার্তা সহ্য করতে পারতুম না। এখানে সন্ধ্যায় পাহড়ের দেওয়ালের গায়ে কুঙ্কুম ছড়ানো সূর্যাস্ত, চা ঝোপের চারিপাশ ঘেরা গোধূলির অন্ধকার, গভীর রাত্রির একটা স্তব্ধ গম্ভীর ভাব, আর সরল গাছের ডালপালার মধ্যে বাতাসের বিচিত্র সুর, ওই আমার কাছে বড় প্রিয়, বড় স্বস্তিকর ব'লে মনে হ'ত।...বসবার ঘরটিতে সাজিয়ে রেখেছিলুম জগতের যুগ যুগের জ্ঞানবীরদের এই Gauss, Zollner Helmholtz, Geikie, Logan, Dawson, যাঁদের আলোক-সামান্য প্রতিভা অমাদের সুন্দরী বসুন্ধরার অতীত শৈশবের, তাঁর রহস্যময় বালিকা-জীবনের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের পাতা আলোকোজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, যাঁদের মনীষার যোগদৃষ্টি অসীম শূন্যের দুরন্ত ভেদ ক'রে নক্ষত্র জগতের তত্ত্ব অবগত হচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত কাটাতুম। জগতের রহস্যভরা অন্ধিসন্ধি তাঁদেরই প্রতিভার তীব্র সার্চ-লাইট-পাতে উজ্জ্বল হয়ে তবে তা আমাদের মত সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সীমার মধ্যে আসছে।

এই রকম সাত আট বছর পরে আবার কলকাতায় গেলুম। ভাবলুম কলকাতাতেই প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করব। মামার বাড়ী গিয়ে উঠলুম। শুনলুম সামনের বাড়ীটায় আমার ভগ্নীপতিরা আর থাকে না, তারা বছর পাঁচ ছয় হ'ল দেশে গিয়েছে। কয়েক মাস কলকাতায় কাটল। প্র্যাকটিস্ যে খুব জ'মে উঠেছিল, এমন নয়, বা অদূর ভবিষ্যতেও যে খুব জ'মে উঠবে, এরকম মনে করবার কোন কারণও দেখতে পাচ্ছিলুম না। এমন

অবস্থায় একদিন সকালে মামার বাড়ীর ওপরের ঘরে ব'সে পড়ছি, এমন সময় কে ঘরে ঢুকল। চেয়ে দেখে প্রথমটা যেন চিনতে পারলুম না। তারপর চিনলুম—টুনি। অনেকদিন তাকে দেখিনি, তার চেহারা খুব বদলে গিয়েছে। আমি তাকে হঠাৎ দেখে যেমন আশ্চর্যও হলুম, তেমনি খুব আনন্দিতও হলুম।

টুনি বললে, সে তার স্বামীর সঙ্গে আজ পাঁচ ছ'দিন হ'ল কলকাতায় এসেছে, সিমুলেতে তাদের কোন্ আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে আছে, আজ বাড়ীর সকলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অন্যান্য কথাবার্তার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেন এখন কোথায়?

টুনি বললে—ছোড়দা এখন আবাদে কোথায় চাকরি করেন, সেখানেই থাকেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—উমারাণী কেমন আছে?

টুনি একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, দাদা সে অনেক কথা, আপনি এখানে আছেন, তা আমি জানতুম। সে সব কথা আপনাকে বলব ব'লেই আমার একরকম এখানে আসা।

আমি বললুম—কি ব্যাপার শুনি? সে ভাল আছে তো?

টুনি বললে—সে ভাল আছে কি, কি আছে সে আপনিই শুনুন না। সেই যে-বছর পুজোর সময় আপনি এখানে ছিলেন, বৌদির বাপের নিতে আসবার কথা ছিল, সে তো আপনি জানেন। তখন তিনি ছুটি পাননি ব'লে আসতে পারেননি, পত্র দিয়েছিলেন পরের মাসে নিয়ে যাবেন। তার বুঝি মাসখানেক পরে খবর এল তিনি কলেরায় মারা গিয়েছেন। বৌদি সেই বিয়ের কনে বাপের বাড়ী থেকে এসেছিল, এমনি অদৃষ্ট, আর সেমুখো হতে হ'ল না। তারপর...

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—উমারাণীর মা?

টুনি বললে—শুনুন না। মা আবার কোথায়? তিনি তো বৌদির বিয়ে হবার আগেই মারা গিয়েছিলেন। তারপর এদিকে আবার দাদা তার সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখেন না। তিনি সেই যেখানে চাকরি করেন, সেখানেই থাকেন, বৌদি থাকেন চাঁপাপুকুরের বাড়ীতে প'ড়ে, দাদা চিঠিপত্রও দেন না। বৌদি বড় শান্ত, বড় চাপা মেয়ে, সে মুখ ফুটে কখনো কিছু বলে না, কিন্তু তার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়। মেয়ে-মানুষের ও কষ্ট যে কি, সে আপনি বুঝবেন না দাদা। যতদিন মা ছিলেন, বৌদিকে কষ্ট জানতে দেননি, তা তিনিও আজ দু'বছর মারা গিয়েছেন। বাড়ীতে আছেন শুধু পিসীমা।

সেই শান্ত ছোট মেয়েটির উপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে গিয়েছে শুনে আমার মনে বড় কষ্ট হল। জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেনের এমন ব্যবহারের মানে কি?

টুনি বললে—তা তিনিই জানেন। তবে তিনি নাকি বলেন, জোর ক'রে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিয়ে করার তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল না, এই সব। বড়দাও দেশের বাড়ীতে থাকেন। বাড়ীতে থাকেন শুধু পিসীমা। কাজেই বৌদির মুখের দিকে চেয়ে তাকে একটু যত্ন ক'রে দুটো কথা বলে, এমন একটা লোক পর্যন্ত নেই। পিসীমা আছেন, কিন্তু সে না থাকার মধ্যে।

সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর বললে—আপনাকে একটা কথা বলি দাদা। আপনি একবার তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসুন। আপনাকে সে যে কি চোখে দেখে তা বলতে পারিনে দাদা। সেবার চাঁপাপুকুরে গিয়েছিলুম, বৌদি বললে, আমার দাদার কথা কিছু জান ঠাকুরঝি? আপনি এদেশ ওদেশ ক'রে বেড়াচ্ছেন শুনে সে কেঁদে বাঁচে না। মাঝে মাঝে যখনই তার কাছে গিয়েছি, আপনার কথা এমন দিন নেই যে সে

বলোন। বলে, ভগবান আমার ভায়ের অভাব পূর্ণ করেছেন, দাদা আর শচীশকে দিয়ে। এখনও পর্যন্ত ফি চিঠিতেই আপনার খোঁজ নেয়। তা বড্ড পোড়াকপালী সে, কারুর কাছ থেকে কোন স্নেহই কোন দিন সে পেল না। আপনার পায়ে পড়ি দাদা, আপনি তাকে একবার গিয়ে দেখা দিয়ে আসুন, আপনি গেলে সে বোধ হয় অর্ধেক দুঃখ ভোলে।

ছাদের আলিসার ওপর থেকে রোদ নেমে গেল, পাশের বাড়ীর চিলছাদের ওপর ব'সে একটা কাক একঘেয়ে চীৎকার করছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেন কি মোটেই বাড়ী যায় না ?

টুনি বললে—সে একরকম না যাওয়াই দাদা। বছরে হয় তো দু'বার ; তাও গিয়ে এক আধ দিন থাকেন। তাও যান সে কি জন্যে! কিস্তী না কি—সেই সময় যার কাছে যা খাজনা পাওয়া যাবে তাই আদায় করতে।

তারপর অন্যান্য এক-আধটা কথাবার্তার পর টুনি চ'লে গেল। সেদিন বিকেলে সেনেট হলে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা ছিল তিনি কেম্‌ব্রিজ থেকে এসেছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতার বিষয়টি ছিল যেমনি চিত্তাকর্ষক,—বক্তৃতার অর্থাংশ ও বক্তার যুক্তিপ্রণালী ছিল তেমনই দুর্বোধ্য। আরম্ভ হবার সময় ছাত্রের দলে হল ভরা থাকলেও বেগতিক বুঝে বক্তৃতার মাঝামাঝি তারা প্রায় স'রে পড়েছিল। কেবল জনকতক নিতান্ত নাছোড়বান্দা রকমের ছাত্র তখনও হলে বিভিন্ন অংশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ব'সে ছিল। বক্তা খ্যাতনামা অধ্যাপক, রয়েল সোসাইটির ফেলো। তাঁর ব্যাখ্যার মৌলিকতার মোহে সকলেই তাঁর বক্তৃতায় অত্যন্ত আকৃষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পোশাক পরা সৌমমূর্তি ঋজুদেহ অধ্যাপককে সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত বোধ হচ্ছিল।...বক্তৃতা শুনতে শুনতে কিন্তু আমার মন ভেসে যাচ্ছিল বক্তৃতার বিষয় থেকে অনেক দূর, কলকাতায় ইট পাথরের রাজ্য থেকে অনেক দূর আমার অভাগিনী বোনটি যেখানে নিঃসঙ্গে জীবন যাপন করছে সেইখানে। মাঝে মাঝে হলের খোলা দুয়ার দিয়ে জ্যোৎস্না-ওঠা বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে উমারাণীর বালিকা মুখখানি বড় বেশী ক'রে মনে পড়ছিল। আর মনে পড়ছিল তার সেই মিনতিভরা দৃষ্টি, অনেক দিন পরে বাবাকে দেখতে পাবার জন্যে তার সে করুণ আগ্রহ। তার আগ্রহভরা দাদা ডাকটি অনেকদিন পরে আবার বড় মনে পড়ল। ভাবলুম সত্যিই কারুর কাছ থেকে কোন স্নেহ কখনো সে পায়নি। আজ বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বকথার রস আমার স্নায়ু-মণ্ডলী বেয়ে সমস্ত দেহে যখন পুলক ছড়িয়ে দিচ্ছে, তখন আমার মনের উন্নত আনন্দের অবস্থার সঙ্গে আমার অভাগিনী স্নেহবঞ্চিতা বোনটির নির্জন জীবনের অবস্থা কল্পনা ক'রে আমার মন কেঁদে উঠল। বাইরের জগতে যখন এত বিচিত্রস্রোত বয়ে যাচ্ছে, তখন সে কি ঘরের কোণে বসে দিনরাত চোখের জলে ভাসবে ? জগতের আনন্দবার্তা তার কাছে বহন ক'রে নিয়ে যাবার কি কেউ নেই ?

বাইরে যখন এলুম তখন গোলদীঘির জলের ওপর চাঁদ উঠেছে, কিন্তু ধোঁয়াভরা আকাশের মধ্যে দিয়ে জ্যোৎস্নার শুভ্রমহিমা আত্মপ্রকাশ করতে পারত না। আমার মস্তিষ্ক তখন বক্তৃতার নেশায় ভরপুর, পুকুরের জলের ধারে সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে মরশুমী ফুলের ক্ষেতগুলো আমার চোখের সামনে এক নতুন মূর্তি ধরেছে। কিন্তু ত্রয়োদশীর অমন বৃষ্টি-ধোয়া যুঁই ফুলের মত জ্যোৎস্নাও ধোঁয়ার জাল কাটিয়ে বাইরে আসতে না পেরে, ব্যর্থতার দুঃখে কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে লক্ষ্য ক'রে আমার একটা কথাই কেবল মনে হতে লাগল—এই জ্যোৎস্না, এই ফুলের ক্ষেত, এই ত্রয়োদশী, এবার-কার মত সব মিথ্যে, সব ব্যর্থ।...ও জ্যোৎস্না প্রতীক্ষায় থাকুক, সেই শুভ রাতটির, যে রাতে আকাশ-ভরা সার্থকতা ওকে বরণ ক'রে নেবে ফোটা ফুলের ঘন সুগন্ধের মধ্যে

দিয়ে, তরুণ-তরুণীদের অনুরাগ-নম্র দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে, গভীর রাতের নীরবতার কাছে পাপিয়ার আকুল আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে।...

বাড়ী এসে ভাবতে ভাবতে, এতদিন নানা কাজের ভিড়ে আমার যে বোনটিকে আমি হারিয়ে বসেছিলুম, তারই কাছে স্নেহের বাণী বয়ে নিয়ে যেতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

এর কয়েকদিন পরে কলকাতা ছেড়ে বার হলুম উমারাণীর কাছে যাব ব'লে। শীত সেদিন নরম প'ড়ে এসেছে, ফুটপাত বেয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দখিন্ হাওয়া অতর্কিত ভাবে গায়ের ওপর এসে প'ড়ে উৎপাত শুরু ক'রে দিয়েছে।...

পরদিন বেলা প্রায় দুটোর সময় ওদের স্টীমার স্টেশনে নেমে শুনলুম, ওদের গাঁ সেখান থেকে প্রায় চার ক্রোশ। হেঁটে যাওয়া ছাড়া নাকি কোন উপায় নেই, কোন রকম যান-বাহনের সম্পূর্ণই অভাব।

কখনো এদেশে আসিনি, জিজ্ঞাসা করতে করতে পথ চলতে লাগলুম। কাঁচা রাস্তার দুধারে মাঠ, মাঝে মাঝে লতাপাতায় তৈরি বড় বড় ঝোপ। কোন কোন ঝোপের তাজা সবুজ ঘন বুনানি মাথা আলো ক'রে ফুটে আছে সাদা সাদা মেটে আলুর ফুল। মাঠে মাঠে মাটির ঢেলার আড়ালে ঝুপসি গাছে দ্রোণ-ফুলের খই ফুটে আছে। মাঠ ছাড়ালে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে মাটির পথের ওপর অভ্যর্থনা বিছেয়ে রেখেছে রাশি রাশি সজ্‌নে ফুল। গ্রামের হাওয়া আমের বোলের আর বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধে মাতাল। বুনো কুলে আর বৈঁচি গাছের বনে কোন কোন মাঠ ভরা। পড়ন্ত রোদে গাছপালার তলায়, বন ঝোপের মধ্যে, ফাঁকা জায়গায় ছোট ছোট পাখীর দল কিচ্ কিচ্ করছে মাঝে মাঝে, কোন কোন জঙ্গলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে কোন অজ্ঞাত বনফুলের এমনি সুগন্ধ বেরুচ্ছে যে, তার কাছে খুব দামী এসেন্সের গন্ধও হার মানে। পায়ের শব্দ পেয়ে শুকনো পাতার রাশির ওপর খস্ খস্ শব্দ করতে করতে দু'একটা খরগোস কান খাড়া ক'রে রাস্তার এপাশের ঝোপ থেকে ওপাশের ঝোপে দৌড়ে পালাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে দূরে দূরে শিমুল ফুলের গাছগুলো দখিন হাওয়ার প্রথম স্পর্শেই আবেশ-বিধুরা তরুণীর মত রাগ-রক্ত হয়ে উঠেছে...

অনেকগুলো গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর একজন দেখালে মাঠ ছাড়িয়ে এবার পড়বে চাঁপাপুকুর। গ্রামের মধ্যে যখন ঢুকলুম তখন গ্রামের পথ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, আশপাশের নানা বাড়ী থেকে পল্লী-লক্ষ্মীদের সাঁজের শাঁখের রব নিস্তব্ধ বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছিল।...

কোন্ ঘরটি আলো ক'রে আছে আমার স্নেহের বোনটি ? কোন্ গৃহস্থের আঙিনার আঁধার আজ দূর হয়ে উঠল তার সেবা-চঞ্চল চরণের শান্ত মধুর ছন্দে ?...

রাস্তার মধ্যে এক জায়গায় কতকগুলো ছেলেকে দেখতে পেয়ে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে তাদের মধ্যে একজন বললে—আসুন, আমি সে বাড়ী আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি। খানিক রাস্তা এগিয়ে গিয়ে সে পাশের একটা সরু পথ বেয়ে চলল। তারপর একটা বড় পুরনো বাড়ীর সামনে গিয়ে বললে, এই তাঁদের বাড়ী। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ীর মধ্যে বলি। একটু পরে একজন বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ীর মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। বৃদ্ধাকে বললে—ইনি কলকাতা থেকে আসছেন জেঠাইমা, আপনাদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে আমি ওপাড়া থেকে নিয়ে আসছি।

বৃদ্ধা আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে আমায় ভাল ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমায় ত চিনতে পারছি নে বাবা, কোন্ জায়গা থেকে তুমি আসছ ?

আমি আমার নাম বললুম—পরিচয় দিতেও উদ্যত হলুম।

বৃদ্ধা ব'লে উঠলেন যে, আমায় আর পরিচয় দিতে হবে না, আমার আসা-যাওয়া নেই ব'লে তিনি কখনো আমায় দেখেননি, তাই চিনতে পারছিলেন না। আমি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি এতে তিনি খুব দুঃখিত হলেন। আমি কেন একেবারে বাড়ীর মধ্যে গেলুম না, আমি তো ঘরের ছেলের বাড়া, আমার আবার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি কি ইত্যাদি।

তাঁর সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। কেবল মনে হ'তে লাগল, আট বছর—আজ আট বছর পরে! কি জানি উমারাণী কেমন আছে, সে কেমন দেখতে হয়েছে। আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমায় দেখে সে যে আনন্দ পাবে, সে আনন্দের পরিমাণ আমি একটু একটু বুঝছি, আমার বুকের তারে তার প্রতিধ্বনি গিয়ে বাজছে। আজ এখনি তার স্নেহমধুর ক্ষুদ্র হৃদয়টির সংস্পর্শে আসব, তার কালো চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারব, তার মিষ্টি দাদা ডাকটি শুনব, এ কথা ভেবে আনন্দে আমার মনের পাত্র ছাপিয়ে পড়ছিল।

দেখলুম এদের অবস্থা এক সময় ভাল ছিল, খুব বড় বাড়ী, এখন সব দিকেই ভাঙা ঘরদোর, দেওয়াল ফেটে বড় বড় অশ্বত্থ-চারা উঠেছে। বাইরের উঠান পার হয়ে ভেতর বাড়ীর উঠানের দরজায় পা দিয়েই বৃদ্ধা ব'লে উঠলেন—ও বৌমা, বার হয়ে দেখো কে এসেছে!

কে পিসীমা?—ব'লে প্রদীপ হাতে সে ওদিকের একটা ঘর থেকে বার হয়ে এল, অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম, তার মুখখানি আধ-ঘোমটা দেওয়া, ঘোমটার পাশ দিয়ে চুলগুলো অসংযতভাবে কানের পাশ দিয়ে কাঁধের ওপর পড়েছে, পরনে আধ-ময়লা শাড়ী, চেহারা রোগা রোগা একহারা। এই সেই-ই উমারাণী। তাকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হ'ল সে আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে আর মাথায়ও অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।

কয়েক সেকেন্ড উমারাণী আমায় চিনতে পারলে না, তার পরই যেন হাঁপিয়ে বলে উঠল—দাদা!

অন্য কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না, প্রদীপটা কোনো রকমে নামিয়ে রেখে সে এসে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

আমি তাকে ওঠালুম, তার মুখে দেখলুম এক অপূর্ব ভাব! মনে হ'ল আনন্দ, বিস্ময়, আশা, অভিমান সব ভাবের রংগুলো এক সঙ্গে গুলে তার প্রতিমার মত মুখে কে মাখিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধা বললেন—বাবা, তুমিই আস না, বৌমা দাদা বলতে অজ্ঞান। কত দুঃখ করে, বলে, কলকাতায় থাকলে মাঝে মাঝে দাদার দেখা পেতাম, এ তেপান্তরের পুর, তিনি আসবেন কেমন ক'রে!—বৌমা সতীশকে আগে হাতমুখ ধোবার জলটল দাও, বাছা একটু ঠান্ডা হোক, যে পথ।

হাতমুখ ধোবার পর উমারাণী একটা ঘরের মধ্যে আমায় নিয়ে গেল। আমি যে এখানে এ অবস্থায় হঠাৎ আসব, তা যেন সম্ভাবনার সীমার সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস। অন্ততঃ তার কাছে। তাই বেচারীর মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছিল না। তার আবেগকে স্বাভাবিক গতি লাভের সুযোগ দেবার জন্যে আমিও কোন কথা বলছিলুম না।

একটুখানি দুজনে চুপ করে থাকার পর উমারাণী বললে—দাদা, এতদিন পরে বুঝি মনে পড়ল?

আমি আগেকার মত তার মাথার দু'পাশের চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম—রাণী, আসতে পারিনি হয়ত নানান কাজে। কিন্তু এ কথা মনে ভাবিসনি যে ভুলে গিয়েছিলুম। চেহারা যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে রে, বড্ড কি অসুখ-বিসুখ

হয় ?

আট বছর আগেকার সেই ছোট্ট মেয়েটির মত মুখ নীচু ক'রে একটুখানি হেসে সে চুপ ক'রে রইল।

জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা রাণী, আমি আসব একথা ভেবেছিলি ?

তার দুই চোখ জলে ভ'রে এল, বললে—কি ক'রে ভাবব দাদা! আমি আপনাদের আবার দেখতে পাব, আদর-যত্ন করতে পারব, এমন কপাল যে আমার হবে তা কি ক'রে ভাবব ?

এলোমেলো যে সব চুল তার ঘোমটার আশেপাশে পড়েছিল, সেগুলো সব ঠিকমত সাজিয়ে দিতে দিতে বললুম, সেই জন্যেই ত এলুম রে! আর তোদের দেখবার ইচ্ছে বুঝি আমার হয় না ? ভাবিস বুঝি, দাদাদের মন সব শান-বাঁধানো!

সে বললে—তাই আজ দু'তিন দিন থেকে আমার বাঁ চোখের পাতা অনরবত নাচছে দাদা। আজ ওবেলা যখন ঘাটে যাই, তখন বড্ড নেচেছে। পিসীমাকে বলতে পিসীমা বললেন—মেয়েমানুষের বাঁ চোখ নাচলে ভালো হয়।

আমি বললুম—আমার কথা তোর মোটেই মনে ছিল না, না রে রাণী? সে একথার কোন উত্তর দিল না, তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ রে, সুরেন বাড়ী থেকে গিয়েছে কতদিন ?

সে নতমুখে উত্তর দিল—প্রায় আট মাস।

বললুম—চিঠিপত্র দেয় ?

উত্তরে সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

তার মুখের ভাবে বুঝলুম যে তার বড় ব্যথার স্থানে আমি ঘা দিয়েছি, দুঃখিনী বোনটির এলোমেলো চুলে ঘেরা মুখখানির দিকে তাকিয়ে স্নেহে আমার মন গ'লে গেল। রুমাল বের ক'রে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলুম। কত রাত তার এই রকম চোখের জলে কেটেছে, তার খোঁজ তো কেউ রাখেনি, তার সাক্ষী আছে কেবল আকাশের ঐ গহন অন্ধকার আর চারিপাশের গাছপালার মধ্যেকার ঐ ঝিঁঝিপোকার রব।...

উমারাণী জিজ্ঞাসা করলে—দাদা, আপনি কোথায় থাকেন ?

আমি বললুম—আগে নানা জায়গায় ঘুরছিলুম, এখন ঠিক করেছি কলকাতাতেই থাকব।

সে বললে—আপনি বিয়ে করেছেন দাদা?

বললুম—না রে। বিয়ের তাড়াতাড়ি কি ? সে একদিন করলেই হবে।

ছোট মেয়েটির মতন ঠোঁট দুটি অভিমানে ফুলে উঠল,—বললে—তাই বৈকি ? আপনি ভেবেছেন চিরকাল এই রকম ভেসে ভেসে বেড়াবেন? তা হবে না দাদা, এই বছরেই আপনার বিয়ে দেব।

আমার হাসি পেল, বললুম—দিবি তুই !

সে বললে—দেবই তো, এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই দেব।

আমি বললুম—তা যেন হ'ল। কিন্তু আমার তো বাড়ী-ঘর-দোর নেই, বিয়ে ক'রে রাখব কোথায় ?

সে বললে—কেন দাদা, রাখবার জায়গার বুঝি ভাবনা ? আমি বৌকে এখানে রাখব। দু'জনে মিলে বেশ ঘর-সংসার ক'রব।

আমি একটু গম্ভীর ভাবে বললুম—তা হ'লে পাঁজিখানা আবার যে ফেলে এলুম রাণী, সামনের মাসে দিনটিন যদি থাকে...

উমারাণী বললে—পাঁজি ওপরের ঘরে রয়েছে দাদা। আপনি এখন খাওয়া-দাওয়া

করুন, কাল সকালে দেখলেই হবে।

আশ্বস্ত হলুম। কি বলতে যাচ্ছিলুম, উমারাণী ব'লে উঠল—আপনাকে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করিগে, কাল থেকে পেটে ভাত যায়নি, আপনার মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে দাদা।

তার পরদিন ভোরে উঠে দেখি উমারাণী সেই ভোরে নাইতে যাবার উদ্যোগ করছে। শীত সেদিন সকালে একটু বেশি পড়েছে। উমারাণীর শরীরের দিকে চেয়ে দেখি, তার শরীরে আর কিছু নেই। রাত্রে ভাল টের পাইনি, আট বছর আগেকার সেই স্বাস্থ্য-শ্রীসম্পন্না মেয়েটির সঙ্গে বর্তমানের এই নিতান্ত রোগা মেয়েটির তুলনা ক'রে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—এত সকালে নাইতে যাবার কি দরকার রে রাণী?

সে বললে একটু সকাল সকাল না নেয়ে এলে কখন রান্না চড়াব দাদা? কাল রাত্রে তো আপনার খাওয়াই হয়নি এক রকম।

আমি বললুম—তা হোক। আমাকে যে আটটার মধ্যেই খেতে হবে তার কোন মানে নেই। এত সকালে নাইতে যেতে হবে না তোর।

উমারাণী ঘড়া নামিয়ে রাখল।

পিসীমা বললেন—তোমার কথা, তাই শুনলে বাবা। নইলে ও কি তেমন পাগলী মেয়ে নাকি, দ্বাদশীর দিনে মাঘ মাসের ভোরে নাইতে যাবে। শোনে না, বলি, বৌমা তোমার শরীর ভাল নয়, এত সকালে জলে নেবো না। শোনে না, বলে পিসীমা কাল গিয়েছে আপনার একাদশী, একটু সকাল সকাল কাজ না সেরে নিলে, আপনাকে দুটো খেতে দেব কখন?

সেদিন দুপুরে ওদের ওপরের ঘরে শুয়ে শুয়ে কি বই পড়ছিলুম। উমারাণী এসে চুপ ক'রে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বললুম—কে, রাণী? আয় না ভেতরে!

আমি উঠে বসলুম। সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখলুম তার শরীর আগেকার চেয়েও খুব রোগা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার মুখখানি প্রতিমার মতই টলটল করছে। বয়স যদিও বাইশ-তেইশ হ'ল, তার মুখ এখনও তেরো বছরের মেয়েটির মতই কাঁচা। কথা আরম্ভ করবার ভূমিকাস্বরূপ বললুম—আজ বড় শীত পড়েছে, না?

উমারাণী বললে—হ্যাঁ দাদা। আমি ভাবলুম আপনি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনি দিনমানে ঘুমোন না বুঝি?

বললুম—মাঝে মাঝে হয়তো ঘুমোই। আজ আর ঘুমোব না। আয় এখানে বোস, গল্প করি।

তাকে কাছে বসালুম। তার চুলের অবস্থা দেখে বুঝলুম সে চুলের যত্ন করে না। মুখের আশেপাশে কোঁকড়া চুলের রাশ অযত্নবিন্যস্ত ভাবে পড়েছিল, চুলগুলোর রং কটা হয়ে পড়েছিল। রাত্রের মত চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বললুম—তোর শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে! বিয়ের পর সেই সময় কেমনটি ছিলি! খুব কি জ্বর হয়?

একটু হাসি ছাড়া সে এ কথার কোন উত্তর দিলে না।

আমি বললুম—না, এ কথা ভালো না রাণী। আমি গিয়ে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দেব, সেইটে নিয়মমত খেতে হবে। না হ'লে এ যে মহা কষ্ট।

একটু পরে সে বললে—তা হ'লে সত্যি দাদা, আমি কিন্তু বিয়ের চেষ্টা করব, বলুন!

আমি তার কথায় মনে বড় কৌতুক অনুভব করলুম। এই অবোধ মেয়েটা জানে

না যে সে এমনি একটা প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বসেছে, যাকে কার্যে পরিণত করা তার ক্ষুদ্র শক্তির বাইরে।

বললুম—বকিস নে রাণী।

খানিকক্ষণ হয়ে গেল, সে আর কথা কয় না দেখে পেছন ফিরে দেখি, ছেলেমানুষে হঠাৎ ধমক খেলে যেমন ভরসা-হারা চোখে তাকায়, তার চোখে তেমনি দৃষ্টি। মনে হ'ল, একটা ভুল করেছি, উমারাণী সেই ধরনের মেয়ে, যারা নিজেকে জোর ক'রে কখনও প্রচার করতে পারে না, পরের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দিয়ে স্রোতের জলের শেওলার মত যারা জীবন কাটিয়ে দিতেই অভ্যস্ত। স্নেহ-সুখে সে আবোল-তাবোল বকছিল, এর সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ব্যবহার করতে হবে, বাতাস লজ্জাবতী লতার সঙ্গে যতটা সতর্ক হয়ে চলে তার চেয়েও। কথাটা যতটা পারি সামলে নেবার জন্য বললুম—তোর যদি সত্যি-সত্যি বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকত, তাহ'লে তুই পাঁজিখানা আন্‌তিস। দিন কোন্ মাসে আছে না আছে সেগুলো সব দেখতে হবে তো, না শুধু শুধু তোর কেবল বকুনি।

উমারাণীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে ভয়-ভয় দৃষ্টিটা কেটে গেল। আমার কথার মধ্যে সে আমার বকুনির একটা কারণ খুঁজে পেল। বোধ হয় বিয়ে করবার জন্যে নিতান্ত উৎসুক দাদাটির ওপর তার একটু কৃপাও হ'ল। সে বললে—পাঁজি আপনাকে দিয়ে আজ দেখিয়ে নেব সে তো ভেবেই রেখেছি দাদা। আপনি বসুন, আমি ওঘর থেকে পাঁজিখানা নিয়ে আসি।

দালানের ওপাশে একটা ঘর ছিল। উমারাণী সেই ঘরটার মধ্যে উঠে গেল। সেই সময় পিসীমা নীচে থেকে ডাক দিলেন—বৌমা, নেমে এস, বেলা গেল, চালগুলো আবার কুট্‌তে হবে তো।

উমারাণী ঘরটার বার হয়ে এসে আমার হাতে পাঁজিখানা দিয়ে বললে—আপনি দেখে রাখুন দাদা, আমায় বলবেন এখন। আমি এখুনি আসছি।

সে নীচে নেমে গেল।

তখন বেলা একটু প'ড়ে এসেছে, নীচের বাগানের সদ্য ফোটা বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধে ঘরের বাতাস ভুরভুর করছে, বাগানের পথের পাশের সজনে গাছগুলো ফুলে ভর্তি! ...পড়ন্ত রোদ ঝিরঝিরে বাতাসে পেয়ারা গাছের সাদা ডালগুলো বুটিকাটা রাংতার সাজে মুড়ে দিয়েছে।...

উমারাণী কাজে গিয়েছে, এখন আর আসবে না ভেবে মাঠের দিকে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হ'ল। উঠতে গিয়ে লক্ষ্য করলুম খাটের পাশে একটা কাঠের হাতবাক্স রয়েছে, সেটা অনেক কালের, রং-ওঠা, তাতে চাবির কলটাও নেই। সেই কাঠের বাক্সটার ডালা খুললুম। দেখি তার মধ্যে কতকগুলো টাট্‌কা-তোলা লেবু ফুল, কতকগুলো গাঁদা ফুল, আর কতকগুলো আ-শুকনো ঘেঁটু ফুল। ফুলগুলোর তলায় একটা আধ-ময়লা নেকড়ায় যত্ন ক'রে জড়ানো কি জিনিস। নেকড়ায় এমন কি জিনিস যার সঙ্গে এতগুলো ফুলের কার্য-কারণ সম্পর্ক, এই নির্ণয় করতে কৌতূহলবশতঃ নেকড়ার ভাঁজ খুলে ফেলে দেখলুম তার মধ্যে খানকতক খামের চিঠি। চিঠিগুলোর ওপর উমারাণীর নামে ঠিকানা লেখা, হাতের লেখা ভগ্নীপতি সুরেনের। তার পোস্ট অফিসের মোহর দেখে বুঝলুম চিঠিগুলো পাঁচ-ছয় বছরের পুরানো, একখানা কেবল এক বছর আগে লেখা।

কৃপণের ধনের মত উমারাণী যার পুরোনো চিঠিগুলো এমন সযত্নে রক্ষা করেছে, তার মধুর হৃদয়ের স্নেহচ্ছায়া-গহন যূথীবনে যার স্মৃতির নীরব আরতি এমনি দিনের পর দিন প্রতি সকাল-সাঁঝে চলছে, কেমন সে অভাগা দেবতা, যে এ উপাসনা মন্দিরের

ধূপগন্ধকে এড়িয়ে চিরদিন বাইরে বাইরেই ফিরতে লাগল!…

মাঠ থেকে বেরিয়ে যখন আসি, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ওদের রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে উমারাণী বললে—দাদা এলেন?…আমি উত্তর দেবার পূর্বেই সে হাসিমুখে রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এল। বললে—দাদা বুঝি আমাদের দেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন? কোন্ দিক দিয়ে বেড়িয়ে এলেন, নদীর ধারে বুঝি? তারপর সে বলল—দাদা, আপনি রান্নাঘরে বসবেন? আমি আপনার জন্যে পিঁড়ি পেতে রেখেছি।

পিসীমা বললেন—বৌমার যত অনাছিষ্টি, এখানে বাছাকে ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়ে রাখা।

আমি বললুম—আমার কোন কষ্ট হবে না, এখানে বসি পিসীমা।

রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে বসলুম। উমারাণী খাবার তৈরী ক'রে রেখেছিল, আমায় খেতে দিল, তারপর কাজ করতে ব'সে গেল। দেখলুম সে অনেকগুলো চালের গুঁড়ো, ময়দা ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে পিঠে তৈরি শুরু করেছে। পিসীমা খুবই বৃদ্ধা, তিনি কাজকর্ম বিশেষ কিছু করতে পারেন না। খাটতে সবটাই হচ্ছিল উমারাণীর। রোগা মেয়েটার অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হ'ল, ভাবলুম কেন অনর্থক পিঠে করতে ব'সে মিথ্যে কষ্ট পাওয়া? সেবার আনন্দে উমারাণী যা করতে বসেছে, তার বিরুদ্ধে কোন কথা বললুম না অবশ্য।

জিজ্ঞাসা করলুম—রাণী, আমায় পিঠে গড়তে শিখিয়ে দিবি?

উমারাণীর বড় লজ্জা হ'ল। মুখটি নীচু ক'রে সে বললে—দাদা, আমরা বেঁচে থাকতে পিঠে খাওয়ার ইচ্ছে হ'লে আপনাকে কি পিঠে গ'ড়ে নিতে হবে, যে আপনি পিঠে গড়তে শিখবেন?

পিসীমা বললেন—না, তোমার দাদার পিঠে খাবার ইচ্ছে হ'লে এই সাত লঙ্কা পাড়ি দিয়ে এসে তোমার এখানে খেয়ে যাবেন!

উমারাণী চুপ ক'রে রইল।

আমি বললুম—তা কেন পিসীমা? ও আর এক উপায় বার করেছে, শোনেননি বুঝি?

পিসীমা বললেন—কি বাবা?

আমি বললুম—ও এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই ওর দাদার বিয়ে দেবে।

পিসীমা বললেন—তা বৌমা ঠিক কথাই বলেছে বাবা। এত বড়টি হয়েছ, আর কি বিয়ে না করা ভাল দেখায়? সংসারী হ'তে হবে তো!

উমারাণী বলে উঠল—ভাল কথা দাদা, দিন তখন তো আর দেখা হ'ল না পাঁজিতে আমি আর ওপরে যেতে পারলুম না। অবিশ্যি ক'রে বলবেন খাওয়ার পর রাত্রে।

আমি বললুম—বলব রে বলব। এতদিন তো মনে ছিল না তোর, এখন সামনে পেয়ে বুঝি দাদার ওপর ভারি মায়া।

পিসীমা বললেন—ও তোমার তেমন পাগলী বোন নয় বাবা। সে কথা বুঝি বৌমা বলেনি তোমায়! আজ তিন চার বছর হ'ল, ওরা যখন প্রথম কলকাতা থেকে এখানে আসে, তখন বৌমা এক জোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছে তোমার জন্যে। বলে, দাদা দুঃখু করেছেন যে আমার বোন আমার জুতো বুনে দেবার জন্যে উলবোনা শিখে প্রথম কিনা জুতো বুনলো তার স্বামীর। তা আমি এবার দাদাকে পশমের জুতো পরাব। তারপর ওদের আর কলকাতা যাওয়া হ'ল না, সুরেনের অন্য জায়গায় চাকরি হ'ল। তুমিও আর কখনো এদিকে আসোনি। কাল তুমি আসতেই বৌমার যে আহ্লাদ! আমায় বললে—পিসীমা, আমার সাধ এইবার পুরলো, এতদিন পরে দাদাকে পশমের জুতো পরাতে পারব।

উমারাণীর চোখ দুটি লজ্জায় নীচু হয়ে রইল, প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল তার মুখখানি কিশোরীর মুখের মতন এমন লাবণ্যমাখা অথচ কাঁচা মনে হচ্ছিল যে, বোধ হ'ল নোলক পরলে তাকে এখনও বেশ মানায়।

তারপর নানা কথায় আর খাওয়া শেষ হ'তে অনেক রাত হয়ে গেল। সেদিন অনেক রাত্রে যখন ওপরের ঘরে শুতে গেলুম, তখন চাঁদ উঠেছে। গভীর রাতের মৌন শান্তি সেদিন বড় করুণ হয়ে বাজল আমার মনে। আজ অনেকক্ষণ উমারাণীর নিকট ব'সে থেকে একটা জিনিস বেশ বুঝতে পেরেছি—উমারাণীর থাইসিস্ হয়েছে।

মৃত্যু ওর শান্ত ললাটে তার তিলক পরিয়ে ওকে বরণ ক'রে রেখেছে, শীগ্‌গির ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে অনন্তের পথের তীর্থযাত্রায়...

উমারাণী এক গ্লাস জল দিতে আমার ঘরে ঢুকল। জল নামিয়ে রেখে বললে—কৈ দাদা, সে পাঁজিখানা?

তার মুখখানির দিকে চেয়ে বড় মন কেমন করে উঠল। বললুম—রাণী এদিকে আয়।...একথা আমার মনে উঠল না যে উমারাণী আমার আপন বোন নয় বা আমাদের দুজনেরই বয়স কম। আমিও যেমন নিঃসঙ্কোচে বললুম, সেও তেমনি নিঃসঙ্কোচে এসে আমার পায়ের কাছে খাটের নীচু মাটিতে ব'সে পড়ল। আট বছর আগের মত আজও ওকে আদর ক'রে তার বিদ্রোহী চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বললুম—রাণী, জুতোর কথা কে বলেছিল রে তাকে?

উমারাণী অসীম নির্ভরতার সঙ্গে ছোট্ট মেয়েটির মত খাট থেকে ঝোলানো আমার পায়ের ওপর তার মুখটি লুকিয়ে রাখলে।...ওরে, স্নেহ যদি রোগ সারানোর ওষুধ হ'ত, তাহলে আমি বড় ভাইয়ের স্নেহ তোকে শিশি ভ'রে দাগ কেটে ডাক্তারী ওষুধের মত দিয়ে যেতুম।

আমার প্রশ্নের কোন উত্তর তার কাছ থেকে পেলুম না। কেন পেলুম না, তাও একটু পরেই বুঝলুম। একমাত্র লোক যে ঐ জুতোর কথা জানে বা যার কাছে আমি একসময় এ কথা বলেছিলুম, সে হচ্ছে সুরেন। সুরেনই বোধ হয় বিয়ের পর কোন সময় উমারাণীকে এ কথা ব'লে থাকবে। বড় ভাইয়ের কাছে ছোট বোনটি তো আর সে কথা বলতে পারে না।

বললুম—রাণী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। টুনি বলছিল—মানে, সুরেন কি ঠিক চিঠিপত্র দেয়? বাড়ীটাড়ী আসে?

উমারাণী বড্ড জড়োসড়ো হয়ে গেল। আমার কথার কোন উত্তর দিল না, মুখও তুলে নিলে না, আগের মত আমার পায়ের ওপর মুখটি লুকিয়ে চুপ ক'রে রইল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, তারপর বুঝলুম সে কাঁদছে।...

তাকে সান্ত্বনা কি ব'লে দেব ঠিক বুঝতে পারলুম না, শুধু তার মাথার চুলগুলোর ওপর পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম।...বেশীদিন না রে, সোনার বোনটি, বেশীদিন না। তোর মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে।

ব্যর্থ নারী-হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ পরম নির্ভরতার সঙ্গে তার দাদার বুকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে যখন সে নীচে শুতে নেমে গেল, চাঁদের আলোর তলায় ঘুমন্ত বাতাস সজনে ফুলের মিষ্টি গন্ধে তখন স্বপ্ন দেখছে!

এর দু'তিন দিন পরে তাদের ওখান থেকে চ'লে আসবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। এর আগেই চ'লে আসতুম, কলকাতায় অনেক কাজ ছিল আমার, কিন্তু উমারাণীর করুণ মিনতি এড়াতে না পেরে কিছু দেরী হয়ে গেলো।

কাপড় প'রে তৈরী হয়েছি, উমারাণী কাঁদো-কাঁদো মুখে নিকটে এসে দাঁড়াল। আমায় বললে—আবার কবে আসবেন দাদা?

বললুম—আসব রে আবার পুজোর সময় আসব।

সে বললে—সে যে অনেকদিন! না দাদা, আপনি আষাঢ় মাসে রথের সময় আসবেন। আমাদের এখানে রথের বড় জাঁকজমক হয় দাদা। আর আমি কিন্তু আপনার বিয়ে দেবই এই বছরে, লক্ষ্মী দাদামণি, আপনার পায়ে পড়ি—আপনি অমত করবেন না।

তারপর সে সেই পশমের জুতো জোড়া বের ক'রে আমার সামনে মাটিতে রাখলে। বললে—আমি আন্দাজে বুনেছি, আপনি পায়ে দিয়ে দেখুন দেখি দাদা, হবে'খন বোধ হয়।

জুতো জোড়াটা পায়ে ঠিক হয়েছে দেখে উমারাণী বড় খুশী হ'ল, তার সমস্ত মুখখানা সার্থকতার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তারপর সে আবার বললে—দাদা, আমি আপনার গরীব বোন, কখনো আসেন না এখানে, যদি বা এলেন, না পারলুম ভাল ক'রে খাওয়াতে-দাওয়াতে, না পারলুম আদর-যত্ন করতে। এসে শুধু কষ্টই পেলেন, কি করব, আমার যেমন কপাল!

অনেকদিন অগেকার মত সেই রকম গলায় আঁচল দিয়ে সে আমায় প্রণাম করলে, তার চোখের জল আমার পায়ের ওপর টপ্ টপ্ ক'রে ঝরে পড়তে লাগল।

আমি তাকে উঠিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম—রাণী, তুই আমার মায়ের পেটের বোনই। এ কথা ভুলে যাস নে কখনো যে তোর বড় ভাই এখনও বেঁচে আছে।

যখন চ'লে আসি তখন সে তাদের বাইরের বাড়ীর দোর ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল, আসতে আসতে পেছন ফিরে দেখলুম সে কাতর চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে!

যখন পথের বাঁক ফিরেছি, তখনও তাকে দেখা যাচ্ছিল, বেলাশেষের হলদে রোদ সুপারি গাছের সারির ফাঁক দিয়ে তার রুক্ষ কোঁকড়া চুলে ঘেরা বিষণ্ণ মুখখানির ওপর গিয়ে পড়েছিল।...

বছরখানেক পরে আমি আবার চাকরি নিয়ে গেলুম ময়ূরভঞ্জ রাজস্টেটে। সেখানে থকতে সুরেনের এক পত্রে জানলুম উমারাণী মারা গিয়েছে।

যাবেই তা জানতুম। সেবার যখন তার কাছ থেকে চ'লে আসি তখনই বুঝে এসে-ছিলুম, এই তার সঙ্গে শেষ দেখা। সুরেনকে এসে পত্র লিখেছিলুম উমারাণীর অবস্থা সব খুলে, কোন একটা ভাল জায়গায় তাকে কিছুদিন নিয়ে যেতে। সুরেন লিখেছিল, জমিদারের কাজ-আদায়পত্র হাতে, পুজোর সময় বরং দেখবে, এখন যাবার কোন উপায় নেই ইত্যাদি। উমারাণী মারা গেল সেই ভাদ্র মাসে।

তারপর আরও বছর খানেক কেটে গেল। সেবার কিছুদিন ছুটি নিয়ে কলকাতা এসে দেখলুম ওদের সেই বাড়ীতে ওরা আবার বাস করছে। আমি এসেছি শুনে টুনি দেখা করতে এল। খানিক একথা সেকথার পর টুনি কাগজে-মোড়া একটা কি আমার হাতে দিল, খুলে দেখি মেয়েদের মাথায় দেবার কতকগুলো রুপোর কাঁটা।

টুনি বললে—বৌদি যে ভাদ্র মাসে মারা যায়, আমি সেই শ্রাবণ মাসে চাঁপাপুকুর গিয়েছিলুম। বৌদি আপনার কত গল্প করলে, বললে—মায়ের পেটের ভাই যে কি জিনিস ঠাকুরঝি, তা আমি দাদাকে দিয়ে বুঝেছি। আমার বড় ইচ্ছে আমি দাদার বিয়ে দিয়ে তাঁকে সংসারী ক'রে দেব। দাদা আমার ভেসে ভেসে বেড়ান, কেউ একটু যত্ন করবার নেই, ওতে আমার বড় কষ্ট হয়। ঐ রুপোর কাঁটাগুলো সে গড়িয়েছিল আপনার

বিয়ে হ'লে আপনার বৌকে দেবার জন্যে। সে আষাঢ় মাসে ওগুলো গড়িয়েছিল, আমি গেলে আমায় দেখিয়ে বললে—ইচ্ছে ছিল সোনার চিরুনি দিয়ে দাদার বৌয়ের মুখ দেখব, কিন্তু এত পয়সা কোথায় পাব, এই বছরেই দাদার বিয়ে না দিলে নয়। বিয়ে হোক তারপর চেষ্টা ক'রে গড়িয়ে দেব। কাঁটা ওর বাক্সে তোলা ছিল, তারপর ভাদ্র মাসে বৌদি মারা গেল, আমি তার বাক্স থেকে কাঁটাগুলো বের ক'রে এনেছিলাম আপনাকে দেব ব'লে। কোথায় পয়সা পাবে, সারা বছর জমিয়ে যা করেছিল তাতেই ঐগুলো গড়িয়েছিল ; দাদা তো এক পয়সাও তার হাতে দিতেন না, সংসার-খরচ ব'লে যা দিতেন তাতে সংসার চলাই ভার, তা তো আপনি একবার গিয়ে দেখেই এসেছিলেন !

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তাহলে তার হাতে পয়সা জমল কোথা থেকে ?

টুনি বললে—বৌদি বাজারের খাবার বড় ভালবাসত। ওরা পশ্চিমে থাকত, সেখানে ওসব বোধ হয় তেমন মেলে না, সেই জন্য ঐ বাজারের কচুরি নিমকির ওপর তার কেমন ছেলেমানুষের একটা লোভ ছিল। বৌদি করত কি, নারকেল পাতা চেঁচে ঝাঁটার কাটি করে রাখত, লোকে পয়সা দিয়ে তা কিনে নিয়ে যেত। এই রকম ক'রে যে পয়সা পেত, তাই দিয়ে গোপালনগরের হাট থেকে পাড়ার ছেলে-পিলেদের দিয়ে খাবার আনাত, নিজে খেত, তাদের দিত। আপনি সেবার চ'লে যাবার পর থেকে সেই পয়সায় আর খাবার না খেয়ে তাই জমিয়ে জমিয়ে ঐ রুপোর কাঁটাগুলো গড়িয়েছিল।

আমি বললুম—সে মারা গেল কোন্ সময়ে ?

টুনি বললে—শেষ রাত্রে, প্রায় রাত চারটের সময়। রাত্রে বৌদির ভয়ানক জ্বর হ'ল, সেই জ্বরে একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেল। তার পরদিন বিকালবেলা আমি ওর বিছানার পাশে ব'সে আছি, দেখি বৌদি বালিশের এপাশ ওপাশ হাতড়াচ্ছে, কি যেন খুঁজছে। আমি বললুম—বৌদি লক্ষ্মীটি, ওরকম করছ কেন ? তখন তার ভাল জ্ঞান নেই, যেন আচ্ছন্ন মত। বললে, আমার চিঠিগুলো কোথায় গেল, আমার সেই চিঠিগুলো ? ব'লে আবার বিছানা হাতড়াতে লাগল। দাদা বিয়ের পর প্রথম যেসব চিঠি তাকে লিখেছিলেন সে সেগুলো যত্ন ক'রে ওর বাক্সে তুলে রেখেছিল, আমি তা জানতুম। আমি সেগুলো বাক্স থেকে বের ক'রে নিয়ে এসে তার আঁচলে বেঁধে দিলুম—তখন থামে। তারপর সেই রাত্রেই সে মারা গেল। যখন তাকে বার ক'রে নিয়ে গেল, তখনও তার আঁচলে সেই চিঠিগুলো বাঁধা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেন সে সময় ছিল না ?

টুনি বললে—ছোড়দাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল, তিনি যখন এসে পেঁছুলেন, তখন বৌদিকে দাহ করা হয়ে গিয়েছে।...

অনকে বছর হয়ে গিয়েছে।

এখনও শীতের অবসানে যখন আবার বাতাবী-লেবুর ফুল ফোটে, সজনে-তলায় ফুল কুড়োবার ধুম প'ড়ে যায়, পাড়াগাঁয়ের বন-ঝোপ ঘেঁটু ফুলে আলো ক'রে রাখে, পুকুরের জলে কাঞ্চন-ফুলের রাঙা ছায়া পড়ে, ফাগুন দুপুরের আবেশ-বিভোর রোদ আকাশে-বাতাসে থর্ থর্ কাঁপতে থাকে, তখন আপন মনে ভাবতে ভাবতে কার কথা যেন মনে পড়ে যায়...মনে হয় কে যেন অনেক দূর থেকে এলোমেলো-চুলে ঘেরা কাতর মুখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে...তখন মন বড় কেমন ক'রে ওঠে, হঠাৎ যেন চোখে জল এসে পড়ে...

প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৯